শাহাদত চৌধুরী

২৮ জুলাই ১৯৪৩-২৯ নবেম্বর ২০০৫

গোলাম মোর্তোজা

গল্প বলায় তার কোনো ক্লান্তি ছিল না। যুদ্ধের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের। অনর্গল বলে যেতেন। নিউজপ্রিন্টের প্যাড ছিঁড়ছেন আর কথা বলছেন। কখনো হাসি কখনো কান্না...। খালেদ মোশাররফ বা ক্যাপ্টেন হায়দার প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে আবেগ ধরে রাখতে পারতেন না। মোটা ফ্রেমের চশমার নিচ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো... কথা বন্ধ সামান্য সময়ের জন্যে... আবার গল্প...।

তিনি সারা জীবন বলেছেন অনেক। লিখিয়েছেন তারও বেশি। লেখেননি প্রায় কিছুই।

'কেন লিখছেন না?'

এটা ছিল তার সহকর্মীদের প্রায় প্রতিদিনের প্রশ্ন।

'এখনো সময় করতে পারছি না।'

অথবা বলতেন এভাবে, 'আমি '৭১-এর নয় মাসকে প্রত্যক্ষ করতে চাই বড় ক্যানভাসে। যার জন্যে সময় তো প্রয়োজনই। কেন লিখছি না, এ প্রশ্ন নিজেকে করলে উত্তর পাই না...।'

একাত্তরের গেরিলা শাহাদত চৌধুরীর কথা বলছি। বলছি বিচিত্রা, সাপ্তাহিক ২০০০ সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর কথা। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে বিচিত্রা একটি ইতিহাস। সাপ্তাহিক ২০০০ সেই ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। আর এই ইতিহাসের স্রষ্টা শাহাদত চৌধুরী।

২.

একটি দেশের জন্যে, একটি জাতির জন্যে একজন মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তারচেয়েও সম্ভবত বেশি কিছু করে গেছেন শাহাদত চৌধুরী।

স্বাধীনতার জন্যে অস্ত্র ধরেছেন, যুদ্ধ করেছেন, দেশ স্বাধীন করেছেন। স্বাধীন দেশের সমাজ নির্মাণ করেছেন। তৈরি করেছেন দ্বিধাবিভক্ত মধ্যবিত্তের অবয়ব। নির্ধারণ করে দিয়েছেন মধ্যবিত্তের করণীয়, জাগিয়ে দিয়েছেন মূল্যবোধ, নৈতিকতা।

স্বাধীন দেশের নতুন প্রজন্মের ভালোলাগা, ভালোবাসা, পছন্দ-অপছন্দ, পোশাক... সবকিছুর পেছনেই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন যে মানুষটি, তার নাম শাহাদত চৌধুরী। সাংবাদিকতা কী হতে পারে- সেটারও অনেক কিছু নির্ধারণ করে গেছেন তিনি।

একজন মানুষের বিচিত্র ক্ষেত্রে এত বড় অবদান আছে, আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে তেমন মানুষের দেখা পাওয়া যায়

না, শাহাদত চৌধুরী ছাড়া।

৩.

জামায়াত-শিবিরের মৌলবাদী অপকর্ম ক্রমশ বাড়ছে। শাহাদত চৌধুরী সরকারি মালিকানার বিচিত্রা'র সম্পাদক। সরকারি সমর্থন বা ছত্রছায়ায় চলছে জামায়াতিদের তান্ডব। তখন আবির্ভূত হলেন একজন নেত্রী, জাহানারা ইমাম। জন্ম হলো একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির। ঘাতকদের বিচারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠলো দেশ। জামায়াতিরা ক্ষতিকর প্রাণী, এরা যে ঘৃণার পাত্র- দেশের মানুষ সেটা স্মরণ করলেন আরেকবার। '৭১-এর পর আরেকবার দেখা গেল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির ঐকতান।

এ ক্ষেত্রে যে মানুষটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করলেন তার নাম শাহাদত চৌধুরী। ১৯৯২ সালে বিচিত্রার প্রচ্ছদে এলেন জাহানারা ইমাম। নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন তিনি। ভুলে গেলে চলবে না, বিচিত্রা সরকারি পত্রিকা! যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা এবং নৈতিকতা থাকলে যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়- সেটা প্রমাণ করলেন শাহাদত চৌধুরী।

৪.

বিচিত্র রকমের প্রতিভাবান এই মানুষটির জন্ম খুলনায় ১৯৪৩ সালের ২৮ জুলাই। জেলা জজ বাবা আবদুল হক চৌধুরী, মা জাহানারা চৌধুরীর বারো সন্তানের মধ্যে শাহাদত চৌধুরী ছিলেন ষষ্ঠ।

বাবার বদলির চাকরি। ঘুরেছেন এ জেলা থেকে সে জেলা। শাহাদত চৌধুরী ঘুরেছেন এ স্কুল থেকে সে স্কুল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া মোটামুটি ঠিকই ছিল। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন পরীক্ষার খাতায় একটি কবিতা লিখেছিলেন। পাতাজুড়ে কবিতাটা ছিল এমন- 'উর্দু ভাষা পড়বো না...।' হেডমাস্টার তাকে ডেকে নিলেন রুমে। শাহাদত চৌধুরীর কপালে জুটলো বেদম পিটুনি।

এরপর পড়শোনায় বিরতি। সিদ্ধান্ত নিলেন আর পড়াশোনা করবেন না। এ রকম সিদ্ধান্তের পেছনে পিটুনির কোনো ভূমিকা ছিল কি না সেটা জানা না গেলেও, তিন বছর কেটে গেল এভাবেই। স্কুলে না পড়লে কী হয়, রবীন্দ্রনাথও তো পড়াশোনা করেননি- ভাবটা এমনই। পাঠ বিরতিতে বাবা-মা মনঃক্ষুণ্ন হলেও শাহাদত চৌধুরী হয়ে ওঠার পেছনে এই তিনটি বছর সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অসংখ্য বই পড়েছেন এই তিন বছরে। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন... সবই পড়েছেন। বই নিয়ে পড়ে থেকেছেন দিনের পর দিন।

তারপর গ্রাজুয়েট স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছেন। ভর্তি হয়েছিলেন আর্ট কলেজে। পরের ইতিহাস সবারই জানা।

শাহাদত চৌধুরী পৃথিবী দেখেছেন, তার প্রিয় বাংলাদেশকে দেখেছেন এক চোখ দিয়ে। তার বয়স তখন দশ কি বারো। বাবার সঙ্গে রংপুরে থাকেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার সময় ঘটলো দুর্ঘটনা। ক্রিকেট বল এসে লাগল বাম চোখে। নষ্ট হয়ে গেল চোখ। ১৯৭৭ সালের নবেম্বর মাসে অপারেশন করা হয়েছিল। সংযোজন করা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার রশীদ সাহেবের কর্নিয়া। কিন্তু সংযোজন ঠিকমতো হয়নি। তাকে এক চোখ দিয়েই দেখতে হয়েছে। এ নিয়ে কোনো দুঃখবোধ ছিল না। কাজের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয়নি তার প্রমাণ তো রয়েই গেছে।

'শাহাদত' এবং 'চৌধুরী' মাঝে একটি 'আলী' আছে। অর্থাৎ পুরো নাম শাহাদত আলী চৌধুরী। ম্যাট্রিকুলেশন ফরম ফিলাপের সময় 'আলী' বাদ দিতে চেয়েছিলেন। স্কুলের ক্লার্ক বলেছিলেন, 'আলী' বাদ দিলে নামের কিছু থাকে নাকি! শাহাদত চৌধুরী কোনো নাম হলো!!

৫.

আমার কাছে শাহাদত চৌধুরী ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি। বিশাল মাপের মানুষ। পাঠক হিসেবে দূর থেকে দেখা বিচিত্রার সম্পাদক। এই মানুষটির কাছাকাছি আসার সুযোগ হবে, ভাবিনি কখনো। আমার জন্ম গ্রামে। বই পড়ার, বিশেষ করে ভালো বই পড়ার সুযোগ তেমন একটা ছিল না। এসএসসির পর ভর্তি হলাম ঢাকা কলেজে। সংযোগ ঘটলো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে। কাছাকাছি আসার সুযোগ হলো আরেকজন বিশাল মানুষ আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের। সত্যিকারের কিছু ভালো বই পড়ার সুযোগ হলো এখানে। শিশু-সাহিত্যিক আমীরুল ইসলামের সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীর ভালো সখ্য। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ফ্রি বিজ্ঞাপন ছাপার জন্যে আমীরুল ভাইয়ের সঙ্গে বিচিত্রায় যাই। কোনো কথা না বলে বিজ্ঞাপনের পাশে স্বাক্ষর করে দেন সম্পাদক। পরপর দু'বছর আমীরুল ইসলামের সঙ্গে বইমেলার রিপোর্ট করলাম। '৯৪-৯৫ সালের ঘটনা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদে আড্ডা দেয়া আমাদের নিয়মিত কাজ। সেই আড্ডায় মাঝেমধ্যে আসেন আশরাফ কায়সার, বিচিত্রার সাংবাদিক। তিনিও তখন রীতিমতো বিখ্যাত। কোচিং সেন্টারের কুফল নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে রিপোর্ট করার প্রসঙ্গ উঠলো। আশরাফ কায়সার রিপোর্টটি আমাকে করতে বললেন। কোনো কিছু চিন্তা না করেই রাজি হয়ে গেলাম।

বিচিত্রায় গিয়ে কাছ থেকে দেখলাম শাহাদত চৌধুরীকে। কীভাবে রিপোর্ট করতে হবে বিস্তারিত ব্রিফিং করলেন। ব্রিফিংয়ের

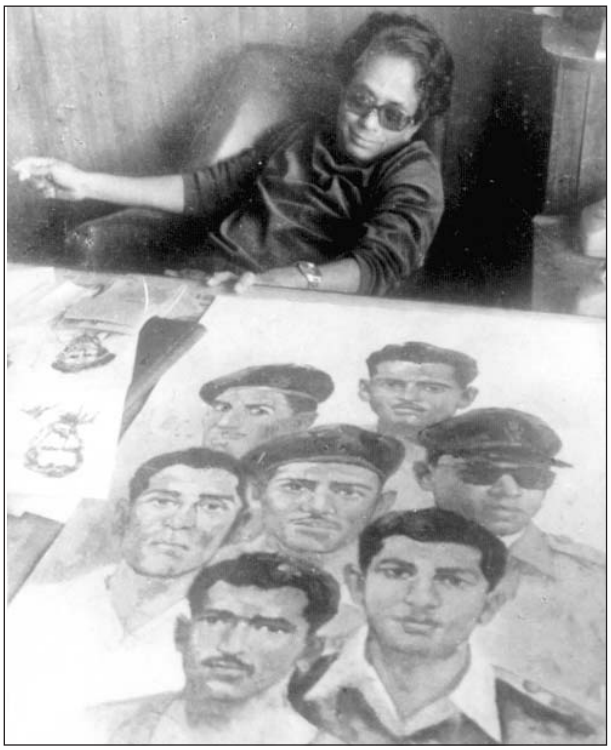

বীরশ্রেষ্ঠদের পোস্টারের সঙ্গে শাহাদত চৌধুরী

স্বাধীনতার পর সাত জন বীরশ্রেষ্ঠের নাম ঘোষণা করেছিল তৎকালীন সরকার। এই সাতজনের নাম, ঠিকানা বীরত্বগাথা কেউ জানতেন না। আমরা বীরশ্রেষ্ঠদের এখন যে ছবি দেখি সেটা শাহাদত চৌধুরীর উদ্যোগেই আঁকা হয়েছিল

কিছু বুঝলাম কিছু বুঝলাম না। তবে পুরোটা না বুঝতে পারলেও এটা বুঝতে পারলাম যে আমার চিন্তাভাবনায় অনেক সমস্যা ছিল। অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর থেকে 'স্টাফ' না হয়েও বিচিত্রা পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। শাহাদত চৌধুরী হয়ে গেলেন শাহাদত ভাই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পড়াশোনা কাজে লাগানোর সুযোগ হলো বিচিত্রায় এসে। বই পড়াটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শাহাদত ভাই সেটা হাতে-কলমে শেখালেন। বিচিত্র বিষয়ে শাহাদত ভাইয়ের জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর রকমের। ফলে যেকোনো আলোচনার তিনি মধ্যমণি হয়ে যেতেন। পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েদের তিনি খুবই পছন্দ করতেন। বয়স শাহাদত ভাইয়ের কাছে কোনো যোগ্যতা বা অযোগ্যতা ছিল না। তিনি সারা জীবন মনেপ্রাণে ছিলেন তরুণ। তরুণদের খুব পছন্দ করতেন। বয়স কম বলে কোনো কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখতেন না। তিনি সব সময় বলতেন, সাতাশ বছর বয়সে আমি বিচিত্রার দায়িত্ব নিয়েছি। তোমরা পারবে না কেন? অবশ্যই পারবে। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবে, তাহলে দেখবে যেকোনো কাজ করতে পারবে।

অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা অফিসে শাহাদত চৌধুরী

৬.

বিচিত্রা বন্ধ হয়ে গেল। সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। শাহাদত ভাই তখন চিন্তা করছিলেন, বাসায় সময় কাটাবেন। ছোটখাটো একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তাও তার মাথায় ছিল। কিন্তু সেই চিন্তা স্থিতি পেল না। আবার উদ্যোগ নিলেন নতুন পত্রিকার। সাপ্তাহিক ২০০০। নতুন নাম, নতুন উদ্যোগ। সে কী উত্তেজনা শাহাদত ভাইয়ের। সারাক্ষণ আলোচনা, মিটিং...। এক নদীতে যেমন দু'বার গোসল করা যায় না, তেমনি নতুন পত্রিকার সাফল্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন অনেকেই। বিচিত্রায় শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে যে জাঁদরেল সাংবাদিকরা ছিলেন, বিচিত্রা থেকে বের হয়ে অনেকেই নতুন পত্রিকা বের করেছেন। ইতিহাস বলে, তাদের কেউ-ই সফল হননি। এবার শাহাদত চৌধুরী বের করছেন নতুন পত্রিকা।

তিনি কী পারবেন, সফল হতে?

স্বাভাবিক এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন তিনি, স্বাভাবিক নিয়মেই। সাপ্তাহিক ২০০০কে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। প্রমাণ করে গেছেন শাহাদত চৌধুরী অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তার জীবনে ব্যর্থতা বলে কোনো শব্দ ছিল না। যা করতে চেয়েছেন, তাই করতে পেরেছেন।

৭.

পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর এখন শাহাদত চৌধুরীকে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, হবে। তাকে নিয়ে অনেক সমালোচনাও শুনেছি বিভিন্ন সময়ে। যেমন তিনি সামরিক সরকারগুলোকে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু সমালোচনা যারা করেন তারা ভুলে যান যে 'বিচিত্রা' ছিল একটি সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা। সেখানে চাকরি করা অবস্থায় তিনি 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' করেছেন। বাংলাদেশের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমলা-মন্ত্রী-রাজনীতিকের বিরাগভাজন হয়েছেন। অনেকবার চাকরি চলে যাওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এসব কিছুকেই তিনি মোকাবেলা করেছেন তার দেশপ্রেম, সততা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ দিয়ে।

শাহাদত চৌধুরী রক্ত মাংসে গড়া একজন মানুষই ছিলেন, অন্য কিছু নয়। ভুল তিনি করেননি, করেননি আপোস- এমন দাবি করা যাবে না, করছিও না। তবে জীবনের কিছু ক্ষেত্র ছিল শাহাদত চৌধুরীর। সেটা হলো দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

বিচিত্রায় এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাতায় পাতায় রয়েছে তার প্রমাণ। বাংলাদেশের ইসলামী-মৌলবাদী, জঙ্গি উত্থান নিয়ে এখন কথা বলছেন সবাই। চিন্তিত সরকার। কিন্তু সবার আগে এই চিন্তার প্রকাশ পেয়েছিল শাহাদত চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক ২০০০-এ। জঙ্গিদের ছবিসহ প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সাপ্তাহিক ২০০০ প্রকাশ করেছিল। জামায়াত যে বিএনপিকে গিলে ফেলছে সেটাও প্রকাশ করেছিল সাপ্তাহিক ২০০০।

অন্য যে কারো চেয়ে শাহাদত চৌধুরী অগ্রসর চিন্তা করতে পারতেন। একজন বড় এবং মহৎ মানুষের এই গুণাবলীর পুরোটাই ছিল তার মধ্যে। '৭৭ সালে অ্যাবরসনের পক্ষে লিখেছেন। অনেকের কাছে ভাবতে অবাক লাগলে মানুষ হিসেবে এতোটাই আধুনিক ছিলেন শাহাদত চৌধুরী।

অন্যকে সম্মান করার শ্রদ্ধা করার ক্ষেত্রে শাহাদত চৌধুরীর কোনো কৃপণতা ছিল না। শিশু এবং নারীদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন তিনি। কোনো নারী তার কাছে এসেছেন, আর তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াননি- এমনটা কখনো ঘটেনি। রিকশাওয়ালাকে 'আপনি' ছাড়া অন্য কোনো কিছু বলে সম্বোধন করেননি কোনোদিন।

স্বাধীনতার পর সাত জন বীরশ্রেষ্ঠের নাম ঘোষণা করেছিল তৎকালীন সরকার। কিন্তু সেটা থেকে গিয়েছিল গেজেট আকারেই। এই সাতজনের নাম, ঠিকানা বীরত্বগাথা কেউ জানতেন না। এই সাত বীরশ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করেছিল বিচিত্রা। শাহাদত ভাইকে এ কাজে সহযোগিতা করেছিলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) আমিন আহমেদ চৌধুরী। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল সাত বীরশ্রেষ্ঠের কয়েকজনের পাসপোর্ট সাইজের অনেক পুরনো আছে ছবি। যা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। সরকারের কাছে সাতজনের যে ঠিকানা ছিল সেগুলোও ঠিক নেই। বিচিত্রা এদের অনুসন্ধান করে।

আমরা বীরশ্রেষ্ঠদের এখন যে ছবি দেখি সেটা শাহাদত চৌধুরীর উদ্যোগেই আঁকা হয়েছিল। এ রকম কত কত কাজ রেখে গেছেন শাহাদত চৌধুরী।

শিল্পী, কচি-কাঁচার মেলার সফল সংগঠক, কিংবদন্তি সম্পাদক- শাহাদত চৌধুরী। ষাটের দশকে গল্প লিখতেন। টাকার প্রয়োজন হলেই লিখে ফেলতেন গল্প। ইত্তেফাকে জমা দিয়ে পেয়ে যেতেন পনেরো টাকা। কাজী আনোয়ার হোসেনের 'মাসুদ রানা'র অনেকগুলো লিখেছেন শাহাদত চৌধুরী। এঁকেছেন মাসুদ

রানা সহ সেবা প্রকাশনী অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারে দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

শাহাদত চৌধুরী ছিলেন কাজে বিশ্বাসী। যারা বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব সারতে চাইতেন তাদের খুবই অপছন্দ করেন।

৮.

শাহাদত ভাই অসুস্থ ছিলেন গত তিন চার বছর ধরে। মাথার পেছন দিকে টিউমার ধরা পড়েছিল। 'রে' দিয়ে সেটাকে ধ্বংসও করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই শরীরটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। ওষুধ খেতে হতো অনেক। তারপর ওষুধ নিয়ে আবার তার নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল। এক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্যে আরেক ওষুধ..., স্টেরয়েড...। এভাবেই চলছিল। গত বছর খুব কম দিনই শাহাদত ভাই অফিসে এসেছেন। তিনি অসুস্থ এটা কখনো বলতে চাইতেন না। আমাদেরও বলতে না করতেন। চাইতেন না তার অসুস্থতা নিয়ে কেউ সহানুভূতি জানাক। পুরনো বন্ধুদের কেউ দেখতে যেতে চাইলে 'না' বলে দিতেন।

হয়তো চাইতেন না '৭১-এর গেরিলাকে কেউ অসুস্থ অসহায়ভাবে কেউ শুয়ে থাকতে দেখুক!

শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার সর্বশেষ দেখা হয় ১৯ নবেম্বর ২০০৫। সে দিন ছিল শনিবার। যাওয়ার আগে ফোন করতেই বললেন, 'তুমি আসো, আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ করে দিতে হবে।'

আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। শাহাদত ভাই অসুস্থ, শুয়ে আছেন। উঠতে পারেন না। কথা বলছেন স্বাভাবিকভাবে। কয়েকটি প্যাকেটের লেখা এক জায়গায় করলাম। বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। প্রায় এক ঘন্টা কথা হলো, অনেক বিষয় নিয়ে। এক পর্যায়ে বললেন, 'তুমি আমার একটা সাক্ষাৎকার নিয়ে রাখবে নাকি...। মুক্তিযুদ্ধের কথা তো লিখতে পারলাম না...। আমি মনে হয় বেঁচে থাকবো অনেক দিন, তবে লিখতে পারবো বলে মনে হয় না। শরীর মনে হয় না এর চেয়ে ভালো হবে।'

আমি সব সময় সাক্ষাৎকার নিতে চাইতাম, শাহাদত ভাই রাজি হতেন না। এই প্রথম নিজে থেকে বললেন, সাক্ষাৎকারের কথা। বললেন, 'আসিফ নজরুল প্রথম আলোতে লিখলো ওর সঙ্গেও তো কথা হলো মাত্র পাঁচ সাত মিনিট।'

শাহাদত ভাইকে কথা দিয়ে এসেছিলাম পরের দিন সাক্ষাৎকার নিতে আসবো। অফিসের কাজের কারণে পরের দিন যেতে পারিনি। শাহাদত ভাই ফোন করলেন, বললাম আপনি আর একটু সুস্থ হয়ে নেন দু-একদিন পরে আসি। শাহাদত ভাই রাজি হলেন। কিন্তু ২২ তারিখে শুনলাম শাহাদত ভাইকে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে রাতেই অবস্থার আরো অবনতি হলো। সেখান থেকে আনা হলো বারডেমের কার্ডিয়াক সেন্টারের সিসিইউতে। অন্যদের 'না' করলেও শাহাদত ভাই সব সময়ই চাইতেন আমি যেন মাঝে মধ্যে তার কাছে যাই। দেখতে নয় গল্প করতে, পত্রিকা নিয়ে, সাহিত্য বা দর্শন নিয়ে...। অধিকাংশ সময়েই যেতে পারতাম না। কারণ সেই অফিস, কাজ, ব্যস্ত...।

কাজ, ব্যস্ততা... এখনো আছে ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে।

শাহাদত ভাই আর কোনো দিন ফোন করে বলবেন না, 'চলে আসো'!

৯.

২৮ নবেম্বর। রাত ১১টার মতো বাজে। ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী সিসিইউ থেকে বের হয়ে এলেন। কী অবস্থা, আমরা ঘিরে ধরলাম তাকে।

'জীবনের জন্যে যুদ্ধ করছেন শাহাদত চৌধুরী। আমি তুমি হলে অনেক আগেই মারা যেতাম। শাহাদত চৌধুরী অন্য জিনিস...। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ...।'

শাহাদত ভাই অসুস্থ, তিনি এর চেয়ে আর ভালো হবেন না- সেটা জানতাম। প্রায় সবাইকে এ কথা বলেছি গত এক বছর ধরে। কিন্তু তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন এটা আমি কখনো ভাবিনি, অনুভব করিনি অথবা করতে চাইনি।

২৪ নবেম্বর সকালে ছুটে গেলাম হাসপাতালে, ডা. মোরশেদ চৌধুরীর ফোন পেয়ে। সিসিইউতে শুয়ে আছেন শাহাদত ভাই। মাথাটা সামান্য নড়ছে...। পাশে দু'তিনটি মনিটরে নানা কিছু ভেসে উঠছে। মোরশেদ ভাই বললেন, 'শরীরের সবকিছুই অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। মনিটরে যা দেখছো তার কোনো কিছুই স্বাভাবিক নয়...।'

প্রথমবারের মতো আমার মনে হলো শাহাদত ভাই সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, একা একা...।

ততক্ষণে শাহাদত ভাইয়ের অবস্থা জেনে গেছেন অনেকেই। জীবন বৃত্তান্ত চেয়ে ফোন আসছে পত্রিকা থেকে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম শাহাদত চৌধুরীর কোনো জীবন বৃত্তান্ত নেই। চাকরির জন্যেও জীবনে কোনো দিন বায়োডাটা তৈরি করেননি। 'বিচিত্রা' এবং 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ চাকরি হয়েছে বায়োডাটা ছাড়াই।

সিসিইউ'র সামনে আত্মীয়-বন্ধু সবার চোখে পানি। আমি খুঁজছি জন্ম তারিখ, স্কুল... কলেজ...।

এত কঠিন কাজ শাহাদত ভাই আমাকে দিয়ে করালেন! শাহাদত ভাই আপনি বলেছিলেন, বেঁচে থাকবেন অনেক দিন...!! আপনি আপনার কথা রাখলেন না...!!!

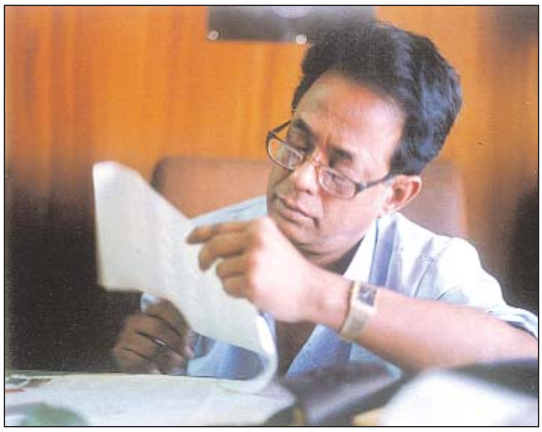

সম্পাদনায় নিমগ্ন শাহাদত চৌধুরী

সিসিইউ'র সামনে আত্মীয়-বন্ধু সবার চোখে পানি। আমি খুঁজছি জন্ম তারিখ, স্কুল... কলেজ...। এত কঠিন কাজ শাহাদত ভাই আমাকে দিয়ে করালেন! শাহাদত ভাই আপনি বলেছিলেন, বেঁচে থাকবেন অনেক দিন...!! আপনি আপনার কথা রাখলেন না...!!!

পাদটীকা :

'৭১-এ যুদ্ধ চলাকালীন শাহাদত চৌধুরী ঢাকায় আসতেন। তখন দেখা হতো কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে। শামসুর রাহমানের কবিতা নিয়ে আবার ফিরে যেতেন ২ নং সেক্টরে, মেলাঘরে। সেই কবিতাগুলো ছাপা হতো কলকাতার পত্রিকায়।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত শামসুর রাহমানের 'গেরিলা' কবিতাটি শাহাদত চৌধুরী এবং হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক '৭১-এ ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এটা শাহাদত ভাইয়ের খুব প্রিয় একটি কবিতা।